



A Peer-Reviewed Article
ISSN: 3136-9049
eISSN: 3136-9057

North Bengal International
University Journal
<https://journal.nbiu.edu.bd>

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ: একটি পর্যালোচনা United States Hegemony in the Middle East: A Review Zuyel Rana*

Abstract

The Middle East is of immense importance in international politics due to its strategic location at the crossroads of Asia, Europe and Africa. Religious and historical importance, strategic location, vast oil resources and major international trade routes made the Middle East a focus of interest for major powers, especially the United States, in the 20th century. However, the roots of American hegemony in the Middle East can be traced back to the end of the colonial era after World War II and the rise of the Cold War. Controlling oil, containing Soviet Union influence, and ensuring Israel's security became the main goals of American policy. To achieve these goals, the United States has chosen to form military alliances, provide economic assistance and if necessary, intervene militarily. The United States has always supported Israel, even though Israel has committed genocide in Palestine. To maintain its hegemony in the Middle East, the United States has established various countries, including Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates, Kuwait and Qatar, as its vassal states and has built military bases. On the other hand, the United States military aggression in Iraq, Afghanistan, Syria, Libya, and Yemen in the name of combating terrorism has resulted in humanitarian disasters. These controversial actions by the United States have led to the emergence of various armed groups in the Middle East, which are destroying peace in the region. In recent times, China and Russia attempts to expand their influence in the Middle East and Iran to acquire nuclear power have posed new challenges to United States hegemony in the region. This article will look at the

*Lecturer, Department of Islamic History and Culture, North Bengal International University, Rajshahi, Bangladesh.

historical foundation and evolution of US dominance since World War II in the Middle East, with an emphasis on US control over oil production, US containment efforts, alliances, military interventions and US support for Israel, while studying new threats from China, Russia and Iran's nuclear ambitions.

Keywords: Middle East, Iran, Iraq, Hegemony, Embargo, Cold War.

ভূমিকা

প্রাচীন সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূখণ্ড। বিপুল তেল সম্পদ, কৌশলগত অবস্থান এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা স্বার্থের কারণে মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তেমন ভূমিকা না থাকলেও যুদ্ধের পরে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই অঞ্চলে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ ও ফরাসির সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শূন্যস্থান পূরণ করে। সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং কূটনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে এই অঞ্চলে মার্কিন একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তেলের নিয়ন্ত্রণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিরোধ এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমেরিকার নীতির প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়।^১ এই লক্ষ্যে অর্জনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোট গঠন, অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান, দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি এবং প্রয়োজনে সামরিক হস্তক্ষেপের পথ বেছে নিয়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার অজুহাতে মার্কিন সরকার এই অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেছে। ইরান, রাশিয়া ও চীনের প্রভাব প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। শুধু সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয় বরং অর্থনৈতিক নির্ভরতা সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলকে তার মুখাপেক্ষী করে তুলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আধিপত্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিমিত। পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্ম ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের উৎপত্তিস্থল মধ্যপ্রাচ্য হওয়ার কারণে ধর্মীয় দিক থেকে এর প্রভাব খুবই স্পর্শকাতর। আমেরিকার নৌ ঐতিহাসিক আলফ্রেড থায়ার মাহান তার ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ জার্নাল ন্যাশনাল রিভিউতে প্রকাশিত প্রবন্ধ “দি পারসিয়ান গালফ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন”এ মধ্যপ্রাচ্য নামটি প্রথম ব্যবহার করেন।^২ তবে মধ্যপ্রাচ্যের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। সাধারণত ভূ-মধ্যসাগরের দক্ষিণ এবং পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলসমূহকে মধ্যপ্রাচ্য বলা হয়ে থাকে। আবার লীগের সকল সদস্য রাষ্ট্র এবং তিনটি অনারব রাষ্ট্র তুরস্ক, ইরান ও ইসরাইল মিলে মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদের বিবর্তন

বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্যবাদের সূচনা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে (১৯১৪-১৯১৮)। এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে অংশগ্রহণ করে তার শক্তিমত্তার জানান দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ও ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে তার বিখ্যাত ১৪ দফা নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব পতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান ব্যাংকার চার্লস ডয়েজের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হয় যা ডয়েজ প্লান নামে পরিচিত। জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান করার জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে একই সমস্যা নিয়ে ডয়েজ প্লান এর পরিবর্তে ১৯২৯ সালে মার্কিন অর্থনীতিবিদ Owen D. Young এর নেতৃত্বে ইয়ং পরিকল্পনা প্রণীত হয়। ডয়েজ প্লান ও ইয়ং প্লান মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারেরই নামান্তর। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ খুব একটা দীর্ঘ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য, মিশনারি কার্যকলাপ ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন আগ্রহকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি তিনটি প্রধান লক্ষ্যে অর্জনে পরিচালিত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে-কমিউনিজমের বিস্তার রোধ করা, ইসরাইলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং টেকসই অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা।^১ ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শ্রাযুযুদ্ধের সূচনা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পূঁজিবাদী জোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক জোটের মধ্যে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করেছিল তা শ্রাযুযুদ্ধ নামে পরিচিত। শ্রাযুযুদ্ধের তীব্রতার কারণে মার্কিন সরকার সক্রিয়ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসের এক যৌথসভায় বক্তব্য রাখার সময় তাঁর বিখ্যাত ট্রুম্যান নীতি ঘোষণা করেন। এ নীতিতে বলা হয় যে, অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনো সরকার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য আবেদন করলে মার্কিন সরকার তা বিবেচনা করে দেখবে। এই নীতির অধীনে গ্রীস ও তুরস্কে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া শুরু হয়।^২ ট্রুম্যান নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পারস্য অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিরোধের নামে ইরানের তেল সম্পদকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিরক্ষা সংস্থা (Middle East Defence Organization) গঠন করার প্রয়াস পায়। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তির মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেন, ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সমন্বয়ে বাগদাদ জোট গঠন করে। তবে আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এ চুক্তিতে যোগদান করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে শ্রাযুযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে মার্কিন সরকার ১৯৫৭ সালে এই

অঞ্চলে কমিউনিস্ট প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য আইজেন হওয়ার নীতি ঘোষণা করে।^৫ মধ্যপ্রাচ্যে রুশ সম্প্রসারণ প্রতিরোধের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করাই এ নীতির উদ্দেশ্য। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে বিশ্বে শ্রাযুযুদ্ধের অবসান হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলসহ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য কায়েম হয়।

ফিলিস্তিন - ইসরায়েল সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিতর্কিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৭১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ফিলিস্তিনি আরবদের অধিকার ও অস্তিত্বকে উপেক্ষা করায় এই ঘোষণাকে মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব এবং ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হয়। ইসরায়েলিরা এই বেলফোর ঘোষণাকে আজকের আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি বলে মনে করে। পরবর্তীতে এই ঘোষণার পথ ধরেই ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনের মাতৃভূমিতে বিতর্কিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সমস্যা তৈরী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। কারণ ইসরায়েলই হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার নির্ভরযোগ্য মিত্র দেশ। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত চারবার আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালের প্রতিটি যুদ্ধেই ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় আরবদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কিন্তু ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন আরব বিশ্বে আমেরিকান প্রভাবকে জটিল করে তোলে। তবে একই সাথে আরব বিশ্বের সাথে ইসরায়েলের সংঘাত নিরসনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি প্রক্রিয়ার প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৮ সালে ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান কূটনৈতিক প্রভাবের একটি প্রধান সাফল্য ছিল।^৬ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ওয়াশিংটনে ১৯৯৮ সালে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও ইসরায়েলের মধ্যে উইরিভার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৩ সালের ৩০ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন-ইসরাইলের সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে প্রণীত একটি শান্তি পরিকল্পনা রোডম্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই আমেরিকা এ শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা কখনোই ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকট সমাধান করতে চাইনি। কারণ ইসরায়েল ফিলিস্তিনে ব্যাপক নিপীড়ন, নির্যাতন, গণহত্যা চালালেও আমেরিকা ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়েছে। এমনকি জাতিসংঘে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করেছে। সম্প্রতি ইসরায়েল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজায় নৃশংস হামলা করে। এ হামলার পেছনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাড ট্রাম্পের একটি পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে তিনি গাজাকে দখল করে নতুন ভাবে গড়ে তোলার কথা

বলেছেন। সেজন্য ফিলিস্তিনিদেরকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে এ ভূ-খন্ডের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আসবে বলে তিনি মনে করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখবে।

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার তেল রাজনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বিশ্বে তেলকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চালিকা শক্তি ধরা হয়। আধুনিক অর্থনীতিতে তেলকে প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল পরিমাণ তেল সম্পদের প্রতি নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ১৯০৮ সালে ইরানের ‘মসজিদ-ই সুলাইমান’ নামক স্থানে প্রথম তেল খনির সন্ধান পাওয়া যায়।^১ ব্রিটিশ প্রকৌশলী জর্জ বার্নার্ড রেনল্ডস প্রথম এই তেল খনির আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৩২ সালে সৌদি আরবে তেল আবিষ্কৃত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদির সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে থাকে। ১৯৩৮ সালে কুয়েতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মরু অঞ্চলে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলক্ষেত্র বুরগান আবিষ্কৃত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তেলকে কেন্দ্র করেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ শূন্যস্থান পূরণ করে। এ সময় থেকে মার্কিন কোম্পানিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের তেল উত্তোলন ও নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ১৯৪০ সালে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ৪০% নিয়ন্ত্রণ করত, ১৯৫০ সালে সেখানে ৫০% এর উপর নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভ থেকে তেল আবিষ্কারের নৈপথ্যে ছিল পশ্চিমা বিশ্বের সাতটি সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানি, এ সাতটি কোম্পানির পাঁচটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।^২ ১৯৭০ সালে মধ্যপ্রাচ্যের তেল খাতে মার্কিন বিনিয়োগ ছিল ১.৫ বিলিয়ন ডলার এবং একই বছরে এখান থেকে মুনাফা আসে ১.২ বিলিয়ন ডলার। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর যাতে কোন হুমকি না আসে সে জন্য ‘নিক্সন ডকট্রিন’ প্রণয়ন করেন। এই ডকট্রিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- ইসরায়েলকে সর্বোচ্চ সাহায্য প্রদান এবং ইরানের রেজা শাহ পাহলভীর সরকারকে সমর্থন দান। ১৯৮০ সালে জিমি কার্টার মধ্যপ্রাচ্যের ‘কার্টার ডকট্রিন’ প্রণয়ন করেন। এ ডকট্রিনের মূল কথা ছিল, এই অঞ্চলে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের একটি মৌলিক ভিত্তি হলো তেল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে এখন মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর কম নির্ভরশীল, বৈশ্বিক শক্তি বাজারে এই অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এটিকে আমেরিকান কৌশলগত স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। সৌদি আরব এবং অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে তেল সম্পর্ক দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরী করে, যেখানে আমেরিকা নিরাপত্তা প্রদান করে এবং বিনিময়ে তেল প্রবাহ এবং পেট্রোডলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। পেট্রোডলার ব্যবস্থা, যেখানে তেল প্রধানত মার্কিন ডলারে লেনদেন হয় যা আমেরিকান আধিপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।^৩ স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতি তাতে প্রাধান্য পেয়েছে জ্বালানি। বিশ্ব যে জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি হয়েছে সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের তেল এবং গ্যাসের বিশাল রিজার্ভ মার্কিন সরকারকে এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। বিশ্বের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার শক্তিশালী অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী করতে চেষ্টা করছে। বিশেষকরে নবায়নযোগ্য নয় এমন শক্তির উৎসগুলোকে নিজের দখলে রাখতে চাইছে। এর মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে জ্বালানি খাতে অনেকটাই সাবলম্বী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র খুব সহজেই তার সামরিক ব্যয়ভার বাড়িয়ে দিতে পারবে। সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসনের পেছনে বিশাল তেলের রিজার্ভ মূল ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তেল সম্পদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতটা লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এমন ভূমিকা আগামী দিনগুলোতে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোর জন্য অশনিসংকেত হিসেবে মনে হবে। যে সকল দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতজানু থাকতে বাধ্য হবে না এমন দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান টার্গেটে পরিণত হবে। বিশেষকরে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে।

উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ

১৯৯০ সালের ২ আগস্ট কুয়েতের সাথে দীর্ঘ বিরোধের প্রেক্ষিতে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেন কুয়েতে সামরিক হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নেয় এবং কুয়েতকে ইরাকের ১৯ তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাঝে এর চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ আকারের সামরিক অভিযান পরিচালনার সুযোগ করে দেয়। কুয়েতকে মুক্ত করার জন্য সৌদি বাদশা আমেরিকা এবং বিশ্ববাসীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমেরিকাও ইরাক আক্রমণের এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের এক সভায় তার সহকর্মীদের জানান প্রধানত চারটি কারণে কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসন বন্ধ করার ইচ্ছা তার সরকারের আছে। কারণগুলো হলো- তেল সরবরাহের হুমকি, সাদাম হোসেনের আনবিক বোমা বানানোর প্রস্তুতি বন্ধ করা, ইসরায়েলের নিরাপত্তা এবং আমেরিকার নেতৃত্বের প্রতি হুমকি বন্ধ করা।^{১০} ফলে প্রেসিডেন্ট বুশের নির্দেশে আমেরিকান জেনারেল নরম্যান সোয়ার্জকফকে প্রধান আধিনায়ক করে বহুজাতিক বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকে হামলা চালানোর নির্দেশনাময় স্বাক্ষর করেন। ১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় ২.৩০ মিনিটে বহুজাতিক বাহিনী অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মের মাধ্যমে ইরাকে আক্রমণ শুরু করে। আমেরিকান নেতৃত্বাধীন জোট কুয়েত মুক্ত করে এবং ইরাকি সামরিক শক্তিকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে।^{১১} ইরাকের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করে। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের উপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং দেশটির উপর ও দক্ষিণাঞ্চলে নো-ফ্লাই জোন প্রতিষ্ঠা করে। এই নীতিগুলো ইরাকি জনগণের উপর ভয়াবহ মানবিক প্রভাব ফেলে কিন্তু সাদাম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে

ব্যর্থ হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির একটি নতুন যুগের সূচনা করে। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এই অঞ্চলে আগ্রাসী হস্তক্ষেপের পথ বেছে নেয়। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথভাবে ইরাকে আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণের প্রধান যুক্তি ছিল ইরাক গনবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরী করছে এবং সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত রয়েছে। এই আক্রমণ ছিল আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং নৈতিকতার দিক থেকে ব্যাপকভাবে বিতর্কিত ছিল। কারণ পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন। ‘অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম’ নামে ইঙ্গ মার্কিন এই অভিযানে সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটে। ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাদ্দাম হোসেনের ফাসি কার্যকর করা হয়। সাদ্দাম সরকারের পতন হলে ইরাকের তেল সম্পদ মার্কিন কোম্পানির হাতে চলে যায়। ফলে ইরাকের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়। ইরাকে মার্কিন হামলার সমাপ্তি ঘটে ২০১০ সালে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে। ইরাক যুদ্ধ এবং দখলদারিত্ব মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান আধিপত্যের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে। এর ফলে ইরাকে দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং বিদ্রোহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়, যা হাজার হাজার আমেরিকান সৈনিক এবং লক্ষ লক্ষ ইরাকি নাগরিকের মৃত্যুর কারণ হয়।^{১২} ইরাক যুদ্ধের খরচ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন

১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর মিত্রগুলোকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করে। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের সরকার বিরোধী গেরিলাদের যারা মুজাহিদিন হিসেবে পরিচিত ছিল তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। ১৯৮৫ সালে মার্কিন কংগ্রেস ২৫০ মিলিয়ন ও সিআইএ আরও ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এ খাতে নাশকতামূলক কাজের জন্য।^{১৩} তৎকালীন আফগান সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায় ছিল পাক-মার্কিন মনোভাব। আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে বলে জানিয়ে দেয়। ১৯৮৮ সালে জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে ১৯৮৯ সালে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়নি। ১৯৯৬ সালে তালেবান নামক ধর্মীয় গোষ্ঠী আফগানিস্তানে ক্ষমতায় এলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের বিরোধ শুরু হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হলে মার্কিন সরকার তালেবানদেরকে দায়ী করে। অভিযোগে বলা হয় হামলার মূল হোতা আল কায়েদার ওসামা বিন লাদেনের সাথে তালেবানদের সম্পৃক্ততা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই আক্রমণকে ‘সভ্যতার উপর আক্রমণ’ বলে আখ্যায়িত করে। ফলে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে ইঙ্গ-মার্কিন জোট আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করলে তালেবান সরকারের পতন হয়। আফগানিস্তানে শান্তি

ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ রক্ষাই এ আঘাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো ও মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। ফলে আফগানিস্তানে তালেবানরা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দ্বন্দ্ব

বর্তমান সময়ে ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে তার সূত্রপাত ঘটে অনেক আগে। ১৯৫৩ সালে সিআইএ ইরানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সংঘটিত করে, যা মার্কিন গোপন হস্তক্ষেপের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ।^{১৪} মোসাদ্দেক ইরানের তেল শিল্প জাতীয়করণের উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন, যা ব্রিটিশ ও আমেরিকার তেল কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ‘অপারেশন পিটি অ্যাজার্ন’ নামে অভিহিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৫৩ সালের আগস্টে মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হয়। রেজা শাহ ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, কমিউনিস্ট বিরোধী ও পশ্চিমাপন্থী। বৈদেশিক সহায়তার বিনিময়ে ইরানের তেল সম্পদের মোট মজুতের ৮০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের হাতে তুলে দেয় এই সরকার। ইরানের ক্ষমতার পালাবদল হলেও বেশিরভাগ ইরানি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপকে মেনে নিতে পারেনি। জনরোষ ক্রমে শাহ পরিবারের দিকে ধাবিত হতে থাকে। শাহ সরকার কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে আমেরিকার কাছে থেকে অস্ত্র ক্রয় করে। ফলে ইরানের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশব্যাপী বিপ্লব গুরু হয় এবং আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোহাম্মদ রেজা শাহের পতন ঘটে। ১৯৭৯ সালের ইরানের ইসলামি বিপ্লব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় ধাক্কা ছিল। শাহ সরকারের পতন এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনির ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র থেকে বঞ্চিত করে। মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভি পালিয়ে যান এবং কয়েকমাস পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের সম্পর্ক আরো অবনতি হয়। আয়াতুল্লাহ খোমেনি আমেরিকা ও ইসরায়েলকে ইরানের প্রধান শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৯৭৯ সালের ৪ নভেম্বর একদল ইরানি ছাত্র তেহরানের মার্কিন দূতাবাসে ঢুকে পড়ে এবং ৬০ জনের বেশি কর্মীকে জিম্মি করে রাখে। মার্কিন সরকার ‘অপারেশন ইগল ব্লু’ নামে একটি অভিযান পরিচালনা করলেও জিম্মিদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনা আমেরিকা-ইরান সম্পর্ককে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১৯৮০-১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন প্রদান করে, যদিও প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে।^{১৫} যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইরান থেকে পণ্য আমদানি বন্ধ করে দেয় এবং ১২০০ কোটি ডলারের ইরানি সম্পদ জব্দ করে। ইরানকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে পর্যুদস্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮০ সালে থেকেই ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আসছে। ইরানের নিয়ন্ত্রণাধীন গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের দ্বন্দ্ব সংঘাত। সংকীর্ণ এই নৌপথ পারস্য উপসাগরের সাথে বাকি বিশ্বের যোগসূত্র তৈরী করেছে। বিশ্বের ৪০ শতাংশ তেলবাহী

ট্যাংকার এই প্রণালী দিয়ে চলাচল করে। ১৯৮৮ সালের ১৮ এপ্রিল মার্কিন নৌবাহিনী একটি ফ্রিগেট ইরানের পেতে রাখা মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশ্চাত্য জবাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তিনটি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ১৯৯৬ সালে ইরানের পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিনিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এক নির্বাহী আদেশে ইরান থেকে সব ধরনের পণ্য আমদানি এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সব ধরনের পণ্য ইরানে রপ্তানি বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, জার্মানি ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি করে। তবে চুক্তি হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব থেকেই যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার করতে ইরানের শাসরোধ করার জন্য এবং নতুনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরমাণু চুক্তি করার জন্য ২০১৮ সালে ১২ দফা দাবি পেশ করেন। ইরান শর্ত মানতে রাজি না হওয়ায় ৮ মে, ২০১৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ইরানের উপরে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০২৫ সালের ১০ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে ইসরায়েল ইরানে আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ২৪ জুন, ২০২৫ এই বারো দিনের যুদ্ধ শেষ হয়। সম্প্রতি ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ সাল থেকে ইরানে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে হস্তক্ষেপের হুমকি দেন। ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে অশান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। যদি ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনির ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য শক্তিশালী হবে। মার্কিন সরকারের ধারণা, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের শক্তি খর্ব করা না গেলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরায়েল ও সৌদি আরবের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুরস্ক নীতি

১৯৫২ সালে তুরস্ক ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করলে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করে। ১৯৬০, ১৯৭১ এবং ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি ভূমিকার প্রমাণ না থাকলেও স্নায়ুযুদ্ধের কারণে তুরস্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব মোকাবেলায় মার্কিন সরকার তুরস্কের সামরিক শাসকদের সমর্থন দিয়েছে। তুরস্কের মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ইনসারলিক এয়ার বেস থেকে ইরাক-সিরিয়াতে অভিযান চালাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে তুরস্কের নিরাপত্তা নীতি আংশিকভাবে ওয়াশিংটনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ২০১৬ সালের বার্থ সামরিক অভ্যুত্থানের সময় ফেতুল্লাহ গুলেনকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান সরকারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতানৈক্য দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্র কুর্দিদেরকে তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে বলে তুর্কী সরকার অভিযোগ করে। এছাড়া তুরস্কের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে মার্কিন সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করলে তুরস্ক একে তার ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ’ হিসেবে মনে করে। কূটনৈতিক বিবৃতি, ভিসা সীমাবদ্ধতা এসবের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

তুরস্ক রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্রচুক্তি করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। প্রকৃতপক্ষে তুরস্ক নিজে একাটি স্বাধীন আঞ্চলিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র চায় ন্যাটোর ভিতরে তুরস্ককে নিজেদের কৌশলের সঙ্গে আবদ্ধ রাখতে।

আরব বসন্ত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

২০১০-২০১১ সালের আরব বসন্ত ছিল মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণজাগরণ। ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিউনিসিয়ার যুবক মোহাম্মদ বোয়াজ্জি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা করেন। পরবর্তীতে এই বিদ্রোহের ঢেউ মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ অন্যান্য আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ে।^{১৬} আরব বিশ্বের এ গণজাগরণকে পশ্চিমা বিশ্ব ‘আরব বসন্ত’ নামে অভিহিত করেছে। আরব বসন্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল দ্বিমুখী। একদিকে তারা গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পক্ষে কথা বললেও অন্যদিকে নিজেদের কৌশলগত স্বার্থ যেমন-স্থিতিশীলতা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং তেল সম্পদ রক্ষা করতে বিভিন্ন স্বৈরশাসকের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। আবার কিছুক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তোলে যেমন লিবিয়ায় হস্তক্ষেপ, যা আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাত তুলে ধরে। ওবামা প্রশাসন হোসনি মুবারকের পতনে প্রতিক্রিয়া জানাতে দ্বিধা প্রকাশ করে। দশকের পর দশক ধরে আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরব মিত্রদের একজন হওয়া সত্ত্বেও ওয়াশিংটন শেষ পর্যন্ত মুবারককে সমর্থন প্রত্যাহার করে, যখন তার পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে ২০১৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত মুসলিম ব্রাদারহুড সরকারের প্রধান মুহাম্মদ মুরসিকে পদচ্যুত করে সামরিক সরকার গঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সরকারকে মেনে নেয়। লিবিয়ার শাসক গাদ্দাফি ৪২ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি লিবিয়াতে পশ্চিমা গোষ্ঠী বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ২০১১ সালে আরব বসন্তের জোয়ার যখন লিবিয়ায় এসে লাগে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন জানায়। এ সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো লিবিয়ায় গাদ্দাফির বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ করে। ২০১১ সালের বিমান অভিযানে গাদ্দাফির পতন ও মৃত্যু ঘটে, কিন্তু দেশটিকে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ এবং বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত করে। সিরিয়ায় ২০১১ সালে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ মার্কিন নীতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। ওবামা প্রশাসন প্রাথমিকভাবে বাশার আল-আসাদের প্রস্থানের আহবান জানায় এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সমর্থন দেয়।^{১৭} তবে সিরিয়ার উপর ইরান ও রাশিয়ার প্রভাব থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সুবিধা করতে পারছিল না। ফলে প্রাথমিক ধাক্কায় বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় টিকে থাকে। পরবর্তীতে সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেট সংগঠনের উত্থান হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়ে। ২০১৪ সাল থেকে আমেরিকান নেতৃত্বাধীন জোট সিরিয়ার আইএসের বিরুদ্ধে বিমান অভিযান পরিচালনা করে। রাশিয়া ও ইরানের সহযোগিতায় বাশার আল আসাদ সিরিয়াতে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু ২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর তাঁর চূড়ান্ত পতন ঘটে। এর ফলে সিরিয়ায় ইরান ও রাশিয়ার প্রভাব খর্ব হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ কায়েম করতে সুবিধা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মকাণ্ড

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান আধিপত্যের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হচ্ছে সামরিক উপস্থিতি। এ অঞ্চলের ১৫ টির বেশি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এসব ঘাঁটিতে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার মার্কিন সৈন্য মোতায়েন আছে। এসব ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের বিশাল ভান্ডার মজুত আছে। পাশাপাশি আশেপাশের জলসীমায় মোতায়েন রয়েছে যুদ্ধজাহাজ, যাতে সংকটের সময় শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। মার্কিন বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশগুলোর সাথে যৌথ সামরিক মহড়া করে থাকে। মার্কিন মিত্র দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে ইসরায়েল, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, জর্ডান ও মিসর অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা প্রদানের নামে মিত্র দেশগুলোর আকাশসীমা, বন্দর ও বিমানবন্দর ব্যবহারের সুবিধা, জ্বালানি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অস্ত্র সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে থাকে। এতে তারা স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে চলাচলে বড় ধরনের স্বাধীনতা ও নমনীয়তা পায়। এই সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ রক্ষা, কথিত উগ্রবাদী গোষ্ঠী দমন, মিত্রদের সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান এবং ইসরাইলের দখলদারিত্বে সামরিক সহায়তা নিশ্চিত করে। ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন শুরু করে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সৌদি আরবে ৫ লাখের বেশি মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী ঘাঁটি তৈরী করে বড় পরিসরে অভিযান চালাতে সক্ষম হয়। ভূমধ্যসাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর এবং ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরে সপ্তম নৌবহর এই অঞ্চলে আমেরিকান প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা পালন করেছিল। দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি সমঝোতা বা স্বাগতিক দেশের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের ১৫ টির বেশি দেশে সেনা মোতায়েন করেছে। কিছু দেশে অল্প সংখ্যক সৈন্য থাকলেও উপসাগরীয় অনেক দেশে ১০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে।

১৯৯২ সালে কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে কাতারে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি শুরু হয়। বর্তমানে কাতারে ১৩ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে। আল উদেইদ বিমান ঘাঁটি হলো মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক স্থাপনা এবং বিদেশের সবচেয়ে বড় মার্কিন বিমানঘাঁটি।^{১৮} ১৯৯১ সালে কুয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করে এবং সেখানে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের সময় কুয়েত ছিল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অন্যতম ঘাঁটি। বর্তমানে কুয়েতে ১৩ হাজারের মতো মার্কিন সৈন্য রয়েছে। কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিমানঘাঁটি হচ্ছে আরিফজান। কুয়েতে ইরাকি আত্মসনের সময় মার্কিন সৌদি সামরিক সহযোগিতা শুরু হয়। বর্তমানে এখানে ২৭০০ মার্কিন সেনা রয়েছে। এসব সৈন্য সৌদি আরবের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের কাজে নিয়োজিত। সৌদিআরবে মার্কিন বিমানঘাঁটির মধ্যে রয়েছে আল ইসকান বিমানঘাঁটি, প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটি। সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র দেশ। এখানে প্রায় ৫ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে। প্রধান ঘাঁটিগুলো হচ্ছে আল ধফরা বিমান ঘাঁটি, জেবেল আলী বন্দর, ফুজাইরাহ নৌঘাঁটি। ১৯৪৮ সাল থেকে বাহরাইনে মার্কিন নৌবাহিনী মোতায়েন আছে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের

প্রধান ঘাঁটি হচ্ছে জুফায়ার নৌঘাঁটি, যা মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তর। এছাড়া শেখ ইসা বিমানঘাঁটি, মুহাররা বিমানঘাঁটি। ১৯৮০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন বাহিনী ওমানে প্রবেশাধিকার পায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন ঘাঁটিগুলো হচ্ছে-মাসিরাহ বিমান ঘাঁটি যা গুপ্তচর বিমান ও জলসীমা নজরদারির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রয়েছে আল মুসান্নাহ বিমানঘাঁটি ও থুমরাইত বিমানঘাঁটি। ইরাকে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন ঘাঁটিগুলো হচ্ছে হারির আল-মাকাম বিমানঘাঁটি, বালাদ বিমানঘাঁটি, হাব্বানিয়াহ বিমানঘাঁটি, আইন আল আসাদ বিমানঘাঁটি, তাজি বিমানঘাঁটি এবং স্পাইচার বিমানঘাঁটি। ২০১৫ সালে মার্কিন সেনারা আইএসআইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সিরিয়ায় প্রবেশ করে। এখানে মার্কিন ঘাঁটির মধ্যে আছে আল-তানফ ঘাঁটি, কোবানি, তাল আবিয়াদ, রমেলান, আইন ইসা মাবরুকা। জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটি হচ্ছে মুওয়াফাক সালতি বিমানঘাঁটি এবং আকাবা বিমানবন্দর যা মার্কিন নৌবাহিনীকে সামরিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে মিসর আমেরিকার অন্যতম মিত্র দেশ। মিসরে কোনো মার্কিন যুদ্ধ ঘাঁটি না থাকলেও পশ্চিম কায়রো বিমানঘাঁটি এবং মিসরের বন্দরসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। তুরস্কে যুক্তরাষ্ট্রের ২টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রয়েছে। ইনসিরলিক বিমানঘাঁটি এটি ন্যাটো ও আমেরিকার যৌথ ঘাঁটি এবং ইজমির বিমানঘাঁটি। ইসরাইলে মার্কিন ঘাঁটির কথা স্বীকার করা না হলেও মার্কিন সরকার ইসরাইলকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র প্রদান করে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি এই অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনভাবে সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মূলত এ অঞ্চলে অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। মিত্র দেশগুলোতে নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহ করে থাকে। এর ফলে এ অঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি সামরিক সংঘাতের কারণ হিসেবে কাজ করবে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র সরকার প্রতিষ্ঠার কৌশল মূলত তেল বাণিজ্য, ভূ-রাজনীতি ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে মোকাবেলা এই তিনটি স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে, আবার অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মিত্র দেশগুলোতে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। মিসর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, কাতার, কুয়েত, জর্ডান ও ইসরায়েল এসব দেশগুলোতে কর্তৃত্ববাদী সরকার গঠন হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দিয়েছে। মিত্র দেশগুলোকে মার্কিন সরকার অস্ত্র সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা সহযোগিতা, বাণিজ্যিক সুবিধা, ও ঋণ প্যাকেজ প্রদান করেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী দেশগুলোকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। মূলত তেল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং ইরান, রাশিয়া ও চীনের প্রভাববলয় থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে দূরে রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্র দেশগুলোতে তাবেদারী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

মার্কিন আধিপত্যের প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি

মার্কিন আধিপত্যবাদ গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং জনগণের ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আমেরিকান সমর্থন কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে। ইরাক আক্রমণ এবং সাদাম সরকারের পতন ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে

যা আমেরিকান নীতির বিপরীত ফলাফল।^{১৯} সিরিয়ায় আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সমর্থন চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর উত্থানে অবদান রেখেছে। ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্ব মার্কিন পক্ষপাতিত্ব এবং ইসরাইলের বসতি সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কার্যকর চাপ প্রয়োগে মার্কিন ব্যর্থতা শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জনগনের উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। ইরাক ও আফগান যুদ্ধে কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনে অগণিত বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছে। মার্কিন আত্মসানের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তবচ্যুত করেছে, যা ইউরোপে শরণার্থী ও অভিবাসী সংকট সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন আধিপত্যের চ্যালেঞ্জ

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যবাদ প্রতিরোধ ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, ইরাকে গৃহযুদ্ধ ও সংঘাত বিদ্যমান। ফলে এখানে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি দুশ্চিন্তার বিষয়। ইরান আমেরিকার প্রভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সক্রিয় প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইরান এবং তার সমর্থিত গোষ্ঠী যেমন- লেবাননে হিজবুল্লাহ, ইরাকে শিয়া মিলিশিয়া এবং ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের সমর্থন করে মার্কিন স্বার্থকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও গ্যাসের সরবরাহ বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তেলের দাম ও সরবরাহের উপর স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রকে কৌশলগতভাবে কাজ করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়া ও চীনের প্রভাব বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অধীনে চীন মধ্যপ্রাচ্যে অবকাঠামো প্রকল্পে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।^{২০} চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

উপসংহার

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে একটি ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেল সম্পদের নিরাপত্তা, ইসরায়েলকে রক্ষা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় হয়েছিল। ধীরে ধীরে মার্কিন নীতি এ অঞ্চলের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোতে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং কূটনৈতিক চাপের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন এ আধিপত্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার নামে হস্তক্ষেপ দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশে সশস্ত্র গোষ্ঠীর উদ্ভব শান্তি ও নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ISIS এবং আল-কায়েদার মতো সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো এখনও সক্রিয়। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করতে যুক্তরাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা সমর্থন ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের জন্য অন্তরায় হয়েছে।

কর্তৃত্ববাদী শাসকদের সমর্থন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিভিন্ন দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করেছে। তবে বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রে একক আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে। মার্কিন আধিপত্যবাদ নতুন এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ইরান, রাশিয়া ও চীন মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমাগত প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। রাশিয়ার সামরিক আকাঙ্ক্ষা এবং চীনের অর্থনৈতিক প্রকল্প মার্কিন স্বার্থ বজায় রাখার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ইরানের পারমানবিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চ্যুত করেছে। আগামীতে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ভূমিকা পরিবর্তন হতে পারে। যদিও ইসরায়েলের নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ দমন মার্কিন নীতিতে অগ্রাধিকার থাকবে। মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের সচেতনতা শেষ পর্যন্ত আধিপত্যের শৃঙ্খল থেকে এ অঞ্চলকে মুক্ত করবে।

তথ্যসূত্র

1. Andrew J. Bacevich, *America's Greater Middle East and the Wars for It: A Military History* (New York: Random House, 2016), p.14.
2. Alfred Thayer Mahan, "The Persian Gulf and International Relations," *The National Review* (1902): p.27.
3. মো. ফজলুল হক, *সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য* (ঢাকা: ফেহাস বুকস, ২০১৭), পৃ. ২৯০।
4. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*. ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ.৪৬৮।
5. Salim Yaqub, *Containing Arab Nationalism: The Eisenhower Doctrine and the Middle East* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004), p.23.
6. William B. Quandt, *Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967* (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2005), pp.112–113.
7. জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, পৃ.৪৭৩।
8. হক, *সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য*, পৃ. ১৭৩।
9. David E. Spiro, *The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999), pp.46-47.
10. হক, *সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য*, পৃ. ৩৭৮।

11. Lawrence Freedman and Efraim Karsh, *The Gulf Conflict 1990–1991: Diplomacy and War in the New World Order* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), p.143.
12. Gilbert Burnham et al., “Mortality after the 2003 Invasion of Iraq: A Cross-Sectional Cluster Sample Survey,” *The Lancet* 368, no. 9545 (2006): 1421-28.
13. তারেক শামসুর রেহমান, *বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০২২), পৃ. ২৬৩।
14. Stephen Kinzer, *The Shah's Men: The American Revolution and the Roots of Terrorism in the Middle East* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003), pp. 91-92.
15. Bryan R. Gibson, *Sold Out: US Foreign Policy, Iraq, the Kurds and the Cold War*. (London: Palgrave Macmillan, 2015), p. 36
16. Marc Lynch, *The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East* (New York: PublicAffairs, 2012), pp.72-73.
17. David W. Lesch, *Syria: The Rise and Fall of the Assad Family* (New Haven, CT: Yale University Press, 2012), p.67.
18. David Vine, *Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World* (New York: Metropolitan Books, 2015), pp.134-35.
19. Trita Parsi, *Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy* (New Haven, CT: Yale University Press, 2017), p.107.
20. Jonathan Fulton, *China's Changing Role in the Middle East*. (Washington, DC: Atlantic Council, 2019), p. 81.